ভূমিকা

জীবনানন্দ নিজেকে সমাজ সচেতন কবি হিসেবে চিহ্নিত করতে অস্বীকৃত ছিলেন। এই অস্বীকারের কথা উল্লেখ আছে তাঁর একাধিক চিঠিতে। তাঁর কবিতায় "পারিপার্শ্বিক চেতনার" পরিণতির কথা জানিয়েছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও 'পূর্বাশা' পত্রিকার সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য — একটি চিঠিতে সে কথার উল্লেখ করে জীবনানন্দ লেখেন — "কিন্তু আরো দু-চার রকম চেতনা আছে, আজো যাদের কবিতায় শুদ্ধ ক'রে নিয়ে নির্ণয় ক'রে দেখতে আমি ভালোবাসি।" [১] তাঁর আলোচনায় "শুদ্ধ" পদটি বড় বেশি ব্যবহৃত হয়। তিনি বারবারই একথা মনে করিয়ে দেন — "ইতিহাসবেদের দরকার এবং সমাজ বেদের; কিন্তু সব কবিতায়ই একইভাবে, অথবা কোনো কবিতায়ই উত্তমর্ণ হিসেবে নয়।"[২] কবিতার ভাষা হবে আজকের বিশেষ সময়ের অনুভূতি — "সমাজোৎসারিত বা ইতিহাসবেদী।" প্রসঙ্গত জীবনানন্দ পাশ্চাত্য কবি রিলকের কাব্যে দেখেছেন "নতুন সম্ভাবনা — হয়ত সিদ্ধিরও উন্মেষ" এবং অপর এক ইংরেজ কবি ব্লেকের কবিতার কথা উল্লেখ করে বলেন — "রসাত্মক বাক্য বা সমাজচেতন আবেগ বললে যাঁর কাব্যের কোনো স্পষ্ট সংজ্ঞাই দেওয়া হয় না।" জীবনানন্দের কবিতা যে কবি অমিয় চক্রবর্তীকে রিলকের কথা মনে পড়িয়ে দেয় তার অর্থময়তা বোধহয় এখানেই। রিলকের বোধের সঙ্গে জীবনানন্দের সামীপ্য স্পষ্ট। রিলকের কাব্যসাধনাও দিব্যানুভূতির সাধনা। কবিতায় ভাষার বিশুদ্ধতার কথাও তিনি বলেছেন। এই চিঠিতে রিলকে জানিয়েছেন — "আমরা যদি ক্রমাগত ভালোবাসায় অযোগ্য, সিদ্ধান্তে অনিশ্চিত এবং মৃত্যুর কাছে অক্ষম, তবে কী করে সম্ভব টিকে থাকা? ... হাজার হাজার বছর ধরে জীবন নিয়ে কারবার করছে মানুষ, অথচ প্রাথমিক জরুরী সমস্যাগুলোর সামনেই যে এমন নিঃসহায়, ভয় আর অপসারণের এমন মাঝামাঝি, এমন দুর্বল।" [৩]

ফরাসী কাব্যের "প্রতীকযান" থেকে হয়ত জীবনানন্দ শিল্পপ্রকরণের সাহায্য পেয়েছিলেন, তবুও বলা যায় তাঁর কাব্যজগৎ ফরাসী প্রতীকী কবি মালার্মের থেকে অনেকটাই ভিন্ন। অথচ বিশুদ্ধ কবিতার উদ্‌গাতাদের মধ্যে যিনি প্রধানতম সেই মালার্মেকে প্রায়ই মনে পড়ায় জীবনানন্দের কবিতাভাবনা — "আমি যখন উচ্চারণ করি 'একটি ফুল' তখন আমার স্বর যে বিস্মরণ থেকে মুছে ফেলে সব ধরনের ফুলের আকৃতি, সেখান থেকেই সাধারণ বোঁটাটুকুর উপর দুলে ওঠে অন্য কিছু, — এমন কিছু — যা কেবলি সুর, অন্তঃসার, কোমলতা — পৃথিবীর

কোনো তোড়ায় সে ফুল নেই।" [৪] — মালার্মের সঙ্গে জীবনানন্দের ভাবনার খুব বেশি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না — যখন তিনি নতুন প্রদীপের কল্পনার কথা বলেন, পৃথিবীর সমস্ত দীপ ছেড়ে কিংবা পৃথিবীর সমস্ত জল ছেড়ে নতুন জলের কথা বলেন — কবিতা "সকলের জন্যে নয় — অনেকের জন্যে নয়" — মালার্মের মত তাঁরও এ ধারণা।

এবার আসা যাক কীটসের কথায়। জনৈক সমালোচক লিখেছেন, তাঁর 'অন ফার্স্ট লুকিং ইন্দু চ্যাপম্যান'স হোমার' সনেটটির "Much have I travelled into realms of gold" এই প্রথম লাইনটির কথা মনে আসে, 'বনলতা সেন' কবিতাটির প্রথম চরণটি ('অনেক ঘুরেছি আমি' পদ-বন্ধটির জন্যই হয়ত) পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু এ কেবল বহিরঙ্গ মিলই দেখায়, অন্তরঙ্গ ভাববিচারে প্রবৃত্ত হলে তিনি, আরও উচ্চকণ্ঠে বলা যায় — উভয় কবিতাতেই রয়েছে একটি ভাবনাকেন্দ্র এবং কবিতা দুটির চিত্রকল্প বয়ন তারই মধ্যে হতে উপজাত বিস্ময় নিয়েই। —

"তেমনই দেখেছি তারে অন্ধকারে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর"

এবং

"With exile eyes / He star'd at the pacific"

— উচ্চারণে ভিন্ন মেজাজী হলেও ভাবনায় কিছুটা হলেও সদৃশ। একদিকে কীটসের সনেটে কবির আবিষ্কার উজ্জ্বল-সজ্ঞান-আলোকভাসিত, কটেজ-এর শ্যেণচক্ষু উদগ্রতায় নবায়ত্ত ভূখণ্ডে প্রসারিত করেছেন তাঁর দৃষ্টি। অন্যদিকে জীবনানন্দের অষ্টাদশ-পদীটিতে কবির চোখ যেন প্রেম-অনুরাগময় বিস্ময়ের ঘোরে বিস্মিত-স্মিত কর্তৃত্ব প্রবল নয় — প্রশ্নময় দীর্ঘ অন্বেষণের শেষে আশ্রয় প্রত্যাশী। কবিতা দুটির মেজাজ ও সুর ভিন্ন হলেও প্রতি-তুলনার কাজে দু-একটি পঙ্‌ক্তি অপরিহার্য নয়। জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' থেকে 'সাতটি তারার তিমির' পর্যন্ত প্রায় এক যুগ ব্যাপী প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ আহরণে প্রখ্যাত ইংরেজ কবি ইয়েট্‌স-এর প্রভাব ছিল সর্বাপেক্ষা সক্রিয়। ইয়েট্‌স যেমন তাঁর কাব্য সৃষ্টির আদি পর্যায়ে 'দ্য রোজ' (১৮৯৩) কাব্যগ্রন্থটির মূলসূত্র হিসাবে উল্লেখ করেছেন "In dreams begin resposibilities"-এর কথা, তেমনি জীবনানন্দ স্বপ্নাশ্রয়িতার কথা বলে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' শেষ করেছেন। ইয়েট্‌স পরোক্ষে হাজির বনলতা সেনের একাধিক কবিতায়। 'হায়চিল'-এর কান্নায়, শঙ্খমালার ইমেজে ("A Lady with soft eyes like funeral tapers"), ভোরের আলোর উচ্ছ্বাসে কিংবা বনহংসমিথুন হবার আকাঙ্ক্ষায়। ইয়েট্‌সের ধাঁচে কবিতায় সুরান্তর ঘটেছে জীবানন্দের কাব্যের প্রায় শেষতম পর্বে,

'সাতটি তারার তিমির' যুগে। ভাষার সচলতা-তির্যক শ্লেষ-সংহত গদ্যক অভিঘাত জায়গা নিয়েছে তার রহস্যময় স্বপ্নমেদুর শান্ত ললিত বাণীর পাশে।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র (১৯৩৬) পর 'বনলতা সেন' (১৯৪২)-এর নাম কবিতার সঙ্গে প্রখ্যাত পাশ্চাত্য কবি এডগার এ্যালান পো-র 'টু হেলেন' কবিতাটির সাদৃশ্য চোখে পড়ে। পো-র সম্বোধনমূলক কবিতা, জীবনানন্দের আলেখ্যধর্মী লিরিক মূর্চ্ছনায় আবেগে উদ্বেল। 'বনলতা সেন'-এর সঙ্গে এর নাটকীয় আবিষ্কারের কাহিনী ও তার আকস্মিকতার লিরিক মেজাজে মিল ঘটেছে। পো-র কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে রয়েছে —

"On disparate seas long wont to roam
Thy hyacinth hair thy classic face" — এইসব চিত্রকল্পের সঙ্গে সমালোচকেরা সাযুজ্য খুঁজে পান জীবনানন্দ দাশের "চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা/মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য" আর "অতিদূর সমুদ্রের পর"। বিশিষ্ট সমালোচকের মতে — "... খুঁটিয়ে দেখলে তাই মনে হবে কোনো বিশেষ একটি কবিতার জন্য, কবির মন আহরণ করেছে দেশী তথা বিদেশী কাব্যধারা থেকে; এবং সেই আহরণ পরিশ্রুত, মানস-রসায়নে পরিচর্চিত হয়ে ফিরে এসেছে তাঁর কাব্যে, কখনো নির্মাণের শৈলীতে, কখনো শব্দের চরণে কখনো বড় চমক জাগানো ধাক্কায় চিত্রকল্পে। এই আত্তীকরণে সহজ শক্তির স্ফূর্ততাই জীবনানন্দের কাব্যে এনেছে সেই অনন্য সম্ভব মায়াবীর যাদু, যার হাত পাঠক এড়িয়ে যেতে পারেন না কখনোই।" [৫]

জীবনানন্দের কবি-ব্যক্তিত্বে রবীন্দ্র কাব্যেরই অনস্বীকার্য দান তার রোমান্টিক চেতনাটুকু। 'অনেক আকাশ' কবিতায় 'ওগো শক্তি', 'হে তুমি ক্ষমতা', 'আমি প্রণয়িণী' — 'তুমি হে অধীর, আমার প্রণয়ী' — ইত্যাদি সম্পর্কসূত্র ও সম্বোধনগুলি স্মরণে রেখে বলা যায় — ইতিহাস চেতনা, অন্তর্নিহিত কবিত্ব শক্তিকে জীবনদেবতার মতো পরিচালকের মর্যাদা দান, স্বপ্ন-প্রয়াণ, সৌন্দর্যের পলাতকাবৃত্তি, সৌন্দর্যের প্রাচুর্যে উল্লাস ও অতৃপ্তিবোধ, নির্বস্তুক ভাবরূপের উপমার মূর্ত উপমেয়ের প্রকাশ মানসী প্রিয়ার, করুণ লাবণ্য ও অবক্ষয়িত রূপের প্রতি টান, মৃত্যুমোহ, আনন্দ-বেদনায় মিশ্র শিহরণ, ভয় ও বিস্ময়ের প্রতি আকর্ষণ, রোমাঞ্চ, যন্ত্রণা-বেদনা ও হতাশার প্রতিফলন, প্রকৃতির মুখে জীবনের উল্লাস, প্রকৃতি ও মানুষের একাত্মতা, নিরুদ্দেশ, অতীত ও দুর্নিরীক্ষা ভবিষ্যতের প্রতি টান — এ সমস্তই জীবনানন্দের কাব্যজগতে সঞ্চারিত হয়েছে, যতগুলি লক্ষণ রবীন্দ্র কাব্যালোকে ও সমসাময়িক কবি সঙ্ঘের মনোজগতে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের কাব্যোপলব্ধিগত সংঘর্ষে সমাহৃত হয়েছিল। রবীন্দ্রোত্তর কালের আধুনিকতায়

জীবনানন্দকে এই লক্ষণগুলিই পৌঁছে দিয়েছে। রবীন্দ্রনানুসারী কবি-সমাজ তথাকথিত শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে রবীন্দ্র-রোমান্টিক লক্ষণ ছাড়া যে রোমান্টিক কৃত্রিমতা, চাকচিক্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন, সেই নিরুত্তাপ হৃদয়াবেগ, কৃত্রিমতা, চাকচিক্য বা সমতল সাংবাদিকতা, ছন্দ ও শব্দচেতনা, বাঁধভাঙ্গা উদ্দামতা, ঈষৎ পল্লীনিষ্ঠ রোমান্স জীবনানন্দের সূচনা পর্বের কবিতায় খুঁজে পাওয়া যাবে। সত্যেন্দ্রনাথ বা নজরুল কিংবা মোহিতলালের বক্তব্য ও ধ্বনিসঙ্গীত জীবনানন্দের 'ঝরা পালক'-এও প্রতিধ্বনিত হতে দেখা যায়। যেমন — 'নবীন প্রাণের সাড়া/ আকাশে তুলিয়া ছুটিছে যুক্তবেণীর ধারা' অথবা, 'পাড়ার মাঝারে সবচেয়ে সেই কুঁদুলি মেয়েটি কই?/কতদিন পরে পল্লীর পথে ফিরিয়া এসেছি ফের, —/সারাদিন মান মুখখানি জুড়ে ফুটিত যাহার খই ...।' অথবা, 'ফেনার বৌয়ের নোনতা মৌয়ের মদের গেলাস লুটে/ভোর সাগরের সরাবখানায় — মসল্লাতে জুটে/হিমের ঘুণের বেড়াস গুণের আগুন দানা জ্বেলে।' অথবা, 'ছেড়ে গেলে মর্মন্তুদ মর্মর বেস্টন/সমুদ্রের যৌবনগর্জন/তোমারে ক্ষ্যাপায়ে দেছে, ওহে বীর শের/ টাইফুন-ডঙ্কার হর্ষে ভুলে গেছ অতীত আখের/হে জলধি পাখি!' — এইসব উদাহরণগুলিতে চোখে পড়ে রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল, মোহিতলাল এবং করুণানিধান, কুমুদরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন অথবা কালিদাস রায়ের অনুশীলিত কাব্যচর্চা। জীবনানন্দকে বাংলা কবিতার দীর্ঘকালের ঐতিহ্যের মধ্যেই স্থিত হতে শিক্ষা দিয়েছে — 'বলাকা'র প্রতীক-স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের বিসারিত মুক্তিচেতনা, সত্যেন্দ্রনাথ-নজরুলের ঐতিহ্যাশ্রিত স্বপ্ন-আবেগ, প্রাণশক্তির উন্মাদনা, শব্দধ্বনি-সঙ্গীত-সচেতনতা, নজরুল-মোহিতলালের শেলী সুলভ ঝোড়ো উন্মাদনা এবং করুণানিধান, কুমুদরঞ্জন প্রমুখের পল্লী রোমান্স ও পল্লী নিষ্ঠা। এই ঐতিহ্য লগ্নতাকেই জীবনানন্দ 'কবির শিক্ষা' বলেছেন — কবি যে কালে ও যে সমাজে রয়েছেন এবং যে সময় ও যে সমাজে তিনি ছিলেন না, কিন্তু সে জিনিসগুলো তবু রয়ে গিয়েছিল, আছে ও থাকবে — সে সবের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সৎ কবি তাঁর প্রতিনিয়ত শিক্ষিত মনকে আরও বেশী শিক্ষিত করে নিচ্ছেন এবং যা স্বভাব-প্রতিভা বলে মনে হয়েছিল তাকে আরও স্থির ও বিশুদ্ধ করে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'লিপিকা'য় এক বেদনার আভাস দিয়েছেন, ছোটোখাটো নানা দুঃখের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হৃদয়ের পরিপূর্ণতায় যে বেদনা ও চিত্তের বিস্তারে সর্বজীবে যে সহানুভূতি — সে সময়কালে দু-একজন মহাপুরুষ ছাড়া দেশে সমগ্রভাবেই এই অনুভূতির অভাব ছিল। দেশের দুঃখ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে সচেতন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথে কোনো আস্থা বা চিত্তশুদ্ধি লাভ করা অসম্ভব ছিল — তৎকালীন দেশের দুর্যোগে বর্তমান ও ভবিষ্যতে আস্থাহীন

যুবকের পক্ষে। রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ 'সভ্যতার সংকট' ছাড়া বিশ্বজুড়ে সভ্যতার যে মড়ক তখন লেগেছিল, তাঁর লেখায় নেই; সমগ্রভাবে রবীন্দ্রনাথে দেশের জীবন প্রতিফলিত হয়নি; তাঁর দুর্বর আশা ও ঔপনিষদিক শুভবোধ উজ্জ্বল বা ধ্রুব হলেও বর্তমান জীবন থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন। এই ভাবনাগুলি সে সময়ের কবি-সাহিত্যিকদের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক বাংলা কবিতার আন্দোলন অনিবার্য মনে হয়। শেষ বিচারে সাহিত্যের সঙ্গে বর্তমানের ও প্রত্যক্ষ সত্যের একটি অবিচ্ছেদ সম্পর্ক থাকার দরুণ অনিবার্যরূপেই দেখা দেয় সাহিত্যের হাওয়া বদল। আমরা প্রথম এর ইঙ্গিত পাই নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের রচনায়। তবুও তাঁদের রচনার একাগ্রতার অভাবে কেউই আধুনিক কাব্য আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়াতে পারেন নি। নজরুল ইসলামের প্রাণশক্তি দুর্দম ছিল এবং তাঁর উচ্ছৃঙ্খলতায় কিছুকাল বিকল্প মুক্তিও খুঁজে পেয়েছিল তখনকার দিনের ব্যর্থতাবোধ। তাই কিছুকাল খ্যাতির শীর্ষে থেকে পরবর্তীকালে কবিকৃতি বুদ্বুদ হয়ে গেছে। রবীন্দ্র-পরবর্তীকালে যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ নতুন মনে হলেও এ ভঙ্গি যেন কবিগুরুকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। এই দুঃখবাদ কোন আপাত অগভীর জীবনদর্শন বলে মনে হতে পারে। মোহিতলালের রচনার মধ্যে যেটি সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে, সমালোচকেরা তার নাম দিয়েছেন 'বলিষ্ঠ ভোগবাদ'। যদিও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ও বৈষ্ণব পদাবলীতে ভোগের বন্দনা গান ছিল, তবুও তৎকালীন রবীন্দ্রনাথের সাত্ত্বিক প্রভাব, সামাজিক সংকট ও রাজনৈতিক জীবনের অস্থিরতার মধ্যে বাঙালি পাঠক মোহিতলালের রচনার সঙ্গে একাত্ম হতে প্রস্তুত ছিলেন না। আমাদের অভিরুচি ভোগকে সর্বদা হয় গার্হস্থ্যে মসৃণ করেছে কিংবা অনুরাগে সম্পৃক্ত করেছে — "কবিতায় মোহিতলাল এই মিলনোৎকণ্ঠাকে যত সুন্দর সাজই পরান, পাঠকের কাছে তা নেহাৎই মেসে-হোটেলে থাকা অবিবাহিত যুবকের কামকল্পনা মনে হয়।"[৬]

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সাহিত্যের একজন প্রধান কবি জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)। বাংলার অন্যান্য অগ্রণী কবিরা স্বমহিমায় অবশ্যই অধিষ্ঠিত ছিলেন; কিন্তু জীবনানন্দ আশ্চর্য লোকপ্রিয়তায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। নতুন ইংরাজি কবিতার অনুসরণে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে যে নবায়ন সূচিত হয়েছিল জীবনানন্দ তাঁর অন্যতম অগ্রপথিক। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক' পাঠ করে আবেগপ্রবণ কিশোর কবিকে খুঁজে পাওয়া যায়, যিনি পৃথিবী ও জীবন সম্পর্কে অনেক ভাবগত কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা নজরুল এবং সত্যেন্দ্রনাথ দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তা সম্পূর্ণভাবে কাটিয়ে উঠে নিজস্ব

রসমাধুর্য ও বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি টেনশনের কবি ছিলেন না, কাব্যের অভিব্যক্তির মধ্যে আর একটি উজ্জ্বল ও অনুপম প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁর ভোগবাদ আর তরুণ শক্তির জয় ঘোষণার প্রভাব পড়েছে তাঁর কাব্যে।

জীবনানন্দ লিখেছেন — আজকের মুখ্য কবি নিজের দেশের কবিতায় দীর্ঘকালের ঐতিহ্যের ভিতর স্থিত হয়েও পৃথিবীর, বিশেষত পশ্চিমের, শ্রেষ্ঠ কাব্য উপলব্ধি করতে পেরে বাংলা কবিতাকে এমন এক জায়গায় এনে দাঁড় করাতে পেরেছেন যে তার ভবিষ্যৎ পরিণতির প্রশ্ন শুধু আটকে নেই বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, পূর্ববঙ্গ গীতিকা বা মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথের সত্যের ভিতরই। কিন্তু সে সেখানেও যুক্ত যেখানে মানুষ তার আধুনিক চেতনাকে মহান কবিতায় প্রকাশ করতে পেরেছে। এই আধুনিক চেতনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে তৃতীয় দশকের 'কল্লোল' ও 'কল্লোল' সম্পৃক্ত কবিগোষ্ঠী। মানবিক অবক্ষয়, মনের গহন-গভীরে সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা, মৃত্যুকে পাশে রেখে জীবনের স্বাদ গ্রহণের চেষ্টা করেছেন তাঁরা। রবীন্দ্র-বিরোধী রোমান্টিক হয়েও অচিন্ত্যকুমার কামনা ও সুন্দরের সম্মেলনে আগ্রহী জড় চেতনা ও বৃহৎ মানবে আগ্রহী। সেই বৃহৎ মানবচেতনা ও জড় চেতনা প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতই ক্রিয়াশীল, যার সঙ্গে বিশেষ ভাবে যুক্ত হয়েছে প্রোটোপ্লাজম-বাহিত আদি পঙ্কের চেতনা ও নিপীড়িত শ্রমিক চেতনা। রবীন্দ্র প্রভাবিত হয়েও বুদ্ধদেব বসু পশ্চিমের প্রভাবে প্রেম ও যৌবনাকাঙ্ক্ষাময় প্রকৃতি ও ইন্দ্রিয় সচেতন সৌন্দর্য চেতনায় তিনি সমৃদ্ধ ও রবীন্দ্র প্রভাব অতিক্রান্ত। শ্রেণী সচেতনতা ও প্রকৃতি চেতনার সঙ্গে জনশক্তি প্রত্যয় মিশিয়ে রবীন্দ্র প্রভাবকে উত্তীর্ণ করেছেন বিষ্ণু দে। স্বল্প ও স্তব্ধবাক্ সংহতিতে রবীন্দ্রজগৎ থেকে সরে এসেছেন অমিয় চক্রবর্তী। সমকাল চেতনায় এক বলিষ্ঠ নিঃসঙ্গতাকে আয়ত্ত করেছেন সুধীন্দ্রনাথ এবং জন্ম-মৃত্যুর রহস্যসন্ধানী হয়েছেন — সমকালীন এই কবি গোষ্ঠী কিন্তু সমধর্মী হলেন না — তবে কিছুটা সাধারণ সমধর্মিতা যুগ-লক্ষণে বিদ্যমান থাকতে বাধ্য — "স্বতন্ত্র আধুনিক চেতনা'র ব্যবহারগত সমস্যার সমাধানে এই স্বাতন্ত্র্যচেতন কবিদের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন আছে বলেই সমকালীন উল্লিখিত কবিদের মতো জীবনানন্দও এক স্বতন্ত্র পথ ধরলেন।" [৭]

কবি জীবনানন্দের যথাযথ মূল্যায়ন হয়তো কবি বুদ্ধদেব বসুই করতে পেরেছিলেন। তিনি জানান, কবিতা রচনার ক্ষেত্রে আধুনিক হওয়া সত্ত্বেও, ১৯২০-এর দশক (কল্লোলের যুগ) বাংলা কবিতার জগতে যেভাবে সংজ্ঞায়িত — সাহিত্যের সেই আধুনিকতাকে সেভাবে প্রতিনিধিত্ব করেননি জীবনানন্দ। 'বাংলা কবিতার অনাবিষ্কৃত নদীতে' তিনি ভ্রমণ করেছেন। বুদ্ধদেব বসু

যথার্থ লিখেছেন —

১। "আজ পর্যন্ত জীবনানন্দবাবু বাঙলা কাব্যসাহিত্যে একটি অজ্ঞাতপূর্ব ধারা আবিষ্কার করেছেন বলে' আমাদের মনে হয়। ... অচিন্ত্যবাবুর মত তাঁর এরই মধ্যে অসংখ্য imitator জোটেনি। তার কারণ বোধ হয় এই যে জীবনানন্দবাবুর কাব্যরসের যথার্থ উপলব্ধি একটু সময়সাপেক্ষ; ..." [৮]

২। "তাঁর প্রধান বিশেষত্ব আমরা এই লক্ষ্য করি যে সংস্কৃত শব্দ যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলে' শুধু দেশজ শব্দ ব্যবহার ক'রেই তিনি কবিতা রচনা করতে চাচ্ছেন। ফলে তার diction সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজস্ব বস্তু হয়ে পড়েছে —" [৯]

৩। "এক হিসেবে তাঁকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের antithesis বলা যেতে পারে। প্রেমেন্দ্রবাবু বাস্তব জগতের সকল রূঢ়তা ও কুশ্রীতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ, বাস্তব জীবনের নিষ্ঠুরতা তাঁকে নিরন্তর পীড়া দিচ্ছে। ... জীবনানন্দবাবু এই সংসারের অস্তিত্ব আগাগোড়া অস্বীকার করেছেন, তিনি আমাদের হাত ধরে' এক অপূর্ব রহস্যলোকে নিয়ে যান; — ..." [১০]

মোহিতলালের দেহচেতনার পাশাপাশি কল্লোল যুগের বিদ্রোহী মনোভাব, প্রেমেন্দ্র মিত্র-অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ কল্লোল যুগের কবিদের প্রভাব থাকলেও জীবনানন্দের অনন্যতায় নিজস্ব সৃষ্টি তাঁকে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিছুদিন আগেও জীবনানন্দ ছিলেন কবিদের কবি। আমরা কেবলমাত্র কবির অনন্য কবিতা গ্রন্থগুলিই অবগত আছি। পাঠকের ধারণা — এতদিন পর্যন্ত কেবলমাত্র জীবনানন্দ তাঁর কবিতাতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন, কিন্তু লক্ষ্য করা যায় তিনি শুধু কবি নন, গদ্যশৈলীর যে বিশাল ভান্ডার তিনি সাজিয়েছিলেন তা তাঁর মৃত্যুর চল্লিশোর্ধ কাল অতিক্রান্ত হবার পর ধীরে ধীরে জন মানসের সম্মুখে উন্মোচিত হচ্ছে। দেখা যায় কথা সাহিত্যে তিনি অজ্ঞাতপূর্ব বিষয়ের অবতারণা ও শিল্প উৎকর্ষতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তিনি প্রথম ১৯৫৬ সালে গল্পকার হিসাবে আবির্ভূত হন। জীবনানন্দ দাশের রচিত গদ্যের রচনাশৈলী ও বিষয়ভাবনা তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাসের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে তাঁকে আরও আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে।

কবিতার মতো অনন্বয়, বিচ্ছিন্নতা, নির্বেদ ও নৈঃসঙ্গের অতুল অতল বেদনা জীবনানন্দের ছোটগল্পেও সংক্রামিত হয়েছে। নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হার্দ্য জটিলতা, চিত্তসঙ্কট, দাম্পত্য বিচ্ছিন্নতা, মনোজৈবনিক কামনা-বাসনার শিল্পরাগ নির্মাণ করেছেন জীবনানন্দ দাশ তাঁর ছোটগল্পে। উত্তর-সমর ইয়োরোপীয় সাহিত্যের নান্দনিক মনস্তত্ত্ব ও ব্যক্তি সর্বস্বতার ধারণা

জীবনানন্দের ছোটগল্পে নিয়ে এসেছে আত্মপ্রক্ষেপ বা আত্মময়তা। মূলত পলায়নপ্রবণ, বিচ্ছিন্নতাপীড়িত ও নৈঃসঙ্গশাসিত জীবনানন্দ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তাঁর ছোটগল্প ও অন্যান্য রচনায়। তাঁর ছোটগল্প মূলত থেকে গেছে বৃহত্তর সমাজমানস থেকে প্রচ্ছন্নভাবে বিযুক্ত, ব্যষ্টিবৃত্তে সীমাবদ্ধ; কেননা আত্মবাদী মানুষকে নির্মাণ করতে গিয়ে জীবনানন্দ তাঁর কালিক সঙ্কট, তাঁর সমাজ ও তাঁর পরিপার্শ্ব থেকে বিস্মৃত হয়েছেন। তাঁর উপন্যাস-ছোটগল্প-কবিতায় বা সৃষ্টিশীলতার প্রতিটি প্রান্তে জীবনকে তিনি প্রেমের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে সংযুক্ত করেছেন। যুদ্ধোত্তর সময়ের প্রভাবে আস্থা ও আশ্বাসের পরিবর্তে তাঁর ছোটগল্পে অবিশ্বাস ও সংশয়, বেদনার আর বিচ্ছিন্নতার সুর মুখ্য হয়ে উঠেছে। তবে সেখানে প্রেমের বহুমাত্রিক পরিচয় রয়েছে।

এযুগের দাম্পত্য-প্রেমে দেখা দিয়েছে গভীর সংশয়-অবিশ্বাস ও দুর্মর সন্দেহ। মানুষের চেতনায় নির্বেদ আর নিঃসঙ্গতা সৃষ্টি করেছে যুগলের বিচ্ছিন্নতা। প্রেম বিচ্ছিন্নতাজাত উপযুক্ত প্রবণতার ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায় জীবনানন্দের 'কুয়াশার ভিতর মৃত্যুর সময়', 'মহিষের শিং', 'বাসর ও বিচ্ছেদ', 'সঙ্গ, নিঃসঙ্গ' প্রভৃতি গল্পে। এই দাম্পত্য বিচ্ছিন্নতাজাত নিঃসঙ্গতার শিল্পরূপ জীবনানন্দ নির্মাণ করেছেন যুগসঙ্কটের প্রভাবে। এ সূত্রে স্মরণ করা যায় 'মেয়ে মানুষের রক্তমাংস', 'নকলের খেলায়', 'প্রণয় প্রেমের ভার' প্রভৃতি গল্প। ব্যক্তির কাছে দুঃসহ হয়ে উঠেছে সমস্যাসঙ্কুল পারিবারিক জীবন। সমাজ তাকে শিখিয়েছে 'life is money' — এ অবস্থায় সে একলা সময় কাটাতে ভালোবাসে। সে পরিবারের প্রতি কোন দায়িত্ব উপলব্ধি করে না। আমরা জীবনানন্দের ছোটগল্পেও লক্ষ্য করি পরিবার-বিচ্ছিন্নতাজাত এই নিঃসঙ্গতার উপলব্ধি। এই প্রসঙ্গে নামোল্লেখ করা যায় 'নষ্ট প্রেমের কথা', 'অশ্বত্থের ডালে', 'প্রেম আকাঙ্ক্ষা, দাক্ষিণ্যের তৃষ্ণা', 'কুয়াশার ভিতর মৃত্যুর সময়' ইত্যাদি গল্পের। জীবনানন্দের ছোটগল্পে পরিবার-সমাজ-দাম্পত্য জীবন-প্রেম — এসব থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ সৃষ্টিশীল সত্তায় উত্তীর্ণ হতে চেয়েছে মুক্তির আকুলতায়। তারা হাতে তুলে নিয়েছে লেখনী। জীবনানন্দের ছোটগল্পের নায়কদের রচনায়ও স্রষ্টার নৈঃসঙ্গপীড়িত দীর্ণ আত্মার স্বরূপ প্রতিভাত হয়েছে, মুক্তির স্বাদ তারাও পায়নি। এই ধারার উল্লেখযোগ্য গল্প 'নক্ষত্রের বিরুদ্ধে মানুষ', 'তিমিরময়', 'ক্ষণিকের মুক্তি দেয় ভরিয়া' প্রভৃতি। শতাব্দীর অভিশাপে যে বিচ্ছিন্নতায় ব্যক্তিমন সংক্রামিত হয়েছে সেই বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্তি প্রত্যাশী মানুষের দুর্মর আকাঙ্ক্ষা। তবে জীবনানন্দের ছোটগল্পে সেই বিচ্ছিন্নতা বা নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি প্রত্যাশী কোন পরিচয় আমরা সে অর্থে পাই না। কবিতায়

তিনি যে মুক্তির অনিমেষ আলোর বলয় নির্মাণ করেছেন ইতিহাসজ্ঞান ও কালজ্ঞানের আলোয়, ছোটগল্পে তার সাক্ষর দেখা যায় না। তিনি মানুষের নিঃসঙ্গতার ছবি অঙ্কন করে ও দুর্ভর যন্ত্রণায় গভীরভাবে সমাহিত হয়েও পরিতৃপ্ত।

নারী-পুরুষের সম্পর্ক, দাম্পত্যজীবন ও যৌনজীবন জীবনানন্দের উপন্যাসের বিষয় প্রকরণের একটা বড় অংশ। দাম্পত্য সম্পর্কে কদর্যতা, রূঢ়তা, নির্মমতা ও দানবীয়তা উন্মীলিত হয়েছে — যেখানে তিনি নারী-পুরুষের সম্পর্কের অভিজ্ঞতা বর্ণনা, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা এবং 'খানখান' করেছেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বড় অংশের সঙ্গে প্রায় আত্মজৈবনিক পটভূমিতে তাঁর কল্পনাকুশল নির্মাণ দাম্পত্য সম্পর্ক, নারী-পুরুষের সম্পর্ক, যৌন সম্পর্ক। কদর্যতা-রূঢ়তা ও নির্মমতার দিকে এই অভিজ্ঞতাজাত কল্পনার ঝোঁক — তাঁর ব্রাহ্ম উদারনৈতিক মুখোশের বিপরীতে। কার্যকারণ সূত্রে এই মুখোশের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য হয়ে ওঠে। মুখ লুকোবার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আবহ ছিল তাঁর সময়বোধ। এই সময়বোধের তিনটি ধারা — প্রথমটি নৈসর্গিক, দ্বিতীয়টি ঐতিহাসিক এবং তৃতীয়টি আত্মজৈবনিক। 'জলপাইহাটি', 'মাল্যবান', 'বাসমতীর উপাখ্যান'-এ জীবনানন্দ ধারাভাষ্যের ভূমিকা নিয়েছেন। এর মধ্যে দিয়ে তিনি পরিস্থিতিগত অর্থের পাশাপাশি দার্শনিক ও শৈল্পিক ব্যাখ্যান গভীর করতে চেয়েছেন।

অধস্তন এবং প্রান্তিক কিছু জনপ্রিয় ধারা খুঁজে বের করা জীবনানন্দের একটা বড় কৃতিত্ব। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, বুদ্ধদেব বসু কিংবা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রবর্তিত সাহিত্যধারা ও বাক্‌ভঙ্গির বিপরীতে তিনি ব্যবহার করেছেন অন্তঃশীল, অধস্তন ও প্রান্তিক কিছু জনপ্রিয় ধারা-বিষয়-বাক্‌ভঙ্গি ও রুচি। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্রনাথের তির্যকতার বিপরীতে কলকাতা থেকে দূরে মফস্বলী অবস্থানে, হিন্দু-মুসলমান সমাজ গঠনের প্রায় দূরত্বহীনতা, সহজতা, সাবলীলতা এবং মফস্বলের ব্রাহ্মসমাজের মতাদর্শিক প্রবণতা। সমালোচকের মতে বিদ্যাসাগর, হুতোম বা বঙ্কিমের মৌখিক রীতি থেকে তাঁর উপন্যাসের ভাষার একটা স্তর উঠে এসেছে। এই রীতির মধ্যে তিনি গেঁথে দিয়েছেন কীর্তন-কথকতা, ব্রাহ্ম মন্দিরের পুরোহিতের ঢং-বাকভঙ্গি-শ্লেষ-গাম্ভীর্য। গদ্যের ক্ষেত্রে তিনি কাঠামোহীন ভাবে চরিত্রদের ভাবনা, অভিজ্ঞতা, শব্দ নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন। সেজন্য তাঁর সংলাপ নিয়ম মেনে চলে না, ফুরায় না কিংবা সমাপ্ত থাকে।

কলোনির কলকাতা ও কলোনি-উত্তর কলকাতার সভ্যতা-সংস্কৃতির বিপরীতে জীবনানন্দ সুকৌশলে প্রবর্তিত করেছেন মফস্বলের ঐতিহাসিকতা। উত্তরকালের পাঠককে নদীনালা-চিল-ডাহুক-অর্জুন-হরিতকি গাছের মাধ্যমে হাতছানি দিয়েছেন — মফস্বলের কলোনি কালের

নস্টালজিয়ায় প্রবেশ করার জন্য। সেজন্য তাঁর মুখোশের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাঁর মধ্যে যথেষ্ট ক্রিয়াশীল ছিল ব্যক্তিক হীনমন্যতা ও সাহিত্যিক হীনমন্যতা। তাঁর মনে হত যে পরিমাণ সাহিত্যের 'স্পেস' বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তীর মধ্যে ছিল সে পরিমাণ 'স্পেস' তিনি দখল করতে পারেন নি। কথাসাহিত্য রচনায় কবির আত্মনিষ্ঠা এতটাই আক্ষরিক অর্থে গোপনচারিতার পরিচায়ক হয়ে উঠেছিল যে কবি নিজে গোপনচারিতায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর গদ্যশৈলীর কথা নিজে কাউকে বলে যাননি। কিন্তু কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর গল্প ও উপন্যাস এত বিস্ময়কর ভাবে ক্রমবর্ধমান হয়েছে দিনে দিনে, তা লেখকের অনুপস্থিতিতে তাঁর মহাপ্রয়াণের পর একথা ভাবতে পাঠকের কাছে অকল্পনীয় মনে হয়। উপন্যাসের বিষয়ভাবনা, শিল্প উৎকর্ষের দিক দিয়ে জীবনানন্দ দাশের যে ভাবনা জগতের অন্তিম রহস্যের প্রতি দিক নির্দেশ করছে তা অভাবনীয় সমস্তরকম বিশ্বাস, বোধের মূর্ত ও বিমূর্ত রূপের আগুন প্রজ্জ্বলিত হতে দেখি তাঁর গদ্যশৈলীর মধ্যে।

জীবনানন্দের গদ্য মূলত তাঁর কবিতারই বিস্তার। শকুন আর শেয়ালদের এক অন্ধকার জগৎ তাঁর গদ্য প্রতিমাতেও পাব। চরিত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব আসে মূলত মন আর শরীরের ছিন্নতায়। মাল্যবান একদিন বুঝেছিল, মনটা তার 'স্বাতীর শিশির' হলেও তার শরীরটা 'শুক্তি' নয়। কিন্তু তা 'শামুক গুগলীর মতো ক্লেদাক্ত জিনিস'। জীবনানন্দ ঘনদৃষ্টিতে জেনেছিলেন আধুনিক সভ্যতার এই শারীরিক ক্লেদ। কবিতায় যেটা প্রধানত এক ধূসর পটে, আত্মবিলীনতায় ধরা দেয়, গদ্যে এক আক্রমণময় রক্তিম ভাষায় সে ধ্বংসের ছবি জুগুপ্সাময় হয়ে থাকে মাল্যবানের পৃথিবী — ডস্টয়েভস্কি কিংবা কাফ্‌কার উপন্যাসের মত। অন্যদিকে সামাজিক দায়ে ধর্মঘটের শ্রমিকদের কাছে এসে যখন দেখা দেয় 'সুতীর্থ' উপন্যাসের কর্মভূমি, ঠিক তখনই আস্তে আস্তে দূরে সরে যায় হাঙর, কাঁকড়া আর সাপবেজীর দল। শরীর-মনের দ্বন্দ্ব তখন অনেকটা মিলিয়ে আসে, শহরের মধ্যে যুক্ত হতে থাকে গ্রাম। সুতীর্থর চোখে তখন বড়ো হয়ে উঠতে থাকে সেইসব ছবি — যারা আগুন, যারা আগুন নয় বা যারা আগুন বাঁচিয়ে রেখেছে, বিকেলের নদীর মতো স্নিগ্ধ, নক্ষত্রের রাত্রির মতো দিনাত্মা — যারা আগুন নিভিয়ে ফেলে; মানবসত্তার সেইসব আত্মার মতো ঐ সূর্য। জীবনানন্দের গদ্য প্রতিমায় পশুবলয়ের নিষ্ঠুরতা শেষপর্যন্ত আমরা সহ্য করতে পারি — অধিচেতনের ছবিটি চিনিয়ে দেবেন বলেই। আবার লেখক যখন বলেন, মাল্যবানের অবকল্পনার পাশাপাশি অবপ্রতিভাও আছে। সে চেতনার একটি সূর্যের বদলে অবচেতনার অন্তহীন নক্ষত্র পেয়েছে। আমরা বুঝতে পারি, এ কেবল মাল্যবানের নয়, তার স্রষ্টারও কথা।

যাঁর অন্তহীন নক্ষত্র বহুল প্রতিমায় পুঞ্জ হয়ে উঠছে। জীবনানন্দ যখন অবকল্পনা ও অবচেতনায় দেখেন, আমাদের এই পৃথিবী মেট্রোপলিসে, স্ত্রী পুরুষের সম্পর্ক, মানুষে মানুষে সম্পর্ক, মানুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ সূক্ষ্মতা হারিয়ে ফেলেছে, সফলতাও, সরলতাও। তাঁর কাছে তখন আজকের পৃথিবী দেখা দেয় 'ভোজালি', 'চেঙ্গিস খাঁ'র প্রতীকে বা পশু-পতঙ্গের দমচাপা মিছিলে। তিনি আমাদের পরিবেশের গ্লানিকে সম্পূর্ণ চিনিয়ে দিয়ে তার থেকে উত্তীর্ণ করে নিতে চান। গদ্যকার হিসেবে, জীবনানন্দ যে দৃষ্টিভঙ্গী, শিল্পচেতনার দিক থেকে যে শিল্পসিদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন সেই জায়গা থেকে অনেকেই অনেক ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। জীবনানন্দের গদ্য রচনার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, বিষয় ভাবনার উৎকর্ষতা থেকে আরো নতুন অনেক নিদর্শন আমাদের কাছে রয়েছে। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নতুনভাবে কিছু বলার অবকাশ রয়েছে।

বক্ষ্যমান গবেষণায় তাঁর উপন্যাসগুলির বিষয়ভাবনা ও শিল্পরীতি বিষয়ে আলোচনাকে বাস্তবায়িত করতে নিম্নরূপ অধ্যায়ে সমগ্র পরিকল্পনাটি বিভাজিত করা হল —

প্রথম অধ্যায় ঃ জীবনানন্দ দাশের সংক্ষেপ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ সাহিত্য জীবনে আবির্ভাব ও ক্রমপরিণতি।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ জীবনানন্দের উপন্যাসের পর্ববিভাজন এবং পর্বানুযায়ী বিষয় ও চরিত্র বিশ্লেষণ।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ জীবনানন্দের উপন্যাসের শিল্পশৈলী।

উল্লেখপঞ্জি

১। দীপেন কুমার রায় সংকলিত জীবনানন্দ দশের পত্রাবলী, পৃ. ২৫, উৎস – জীবনানন্দ ঃ জীবন আর সৃষ্টি, সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৬৮৬, প্রকাশক – সমীর কুমার নাথ, নাথ পাবলিশিং, কলকাতা – ৭০০ ০২৯, প্রথম প্রকাশ – বইমেলা/জানুয়ারি ১৯৯৯/মাঘ ১৪০৫

২। জীবনানন্দ দাশ, কবিতার কথা, কলকাতা, ১৩৬২, পৃ. ৬০ (উৎস – তদেব, পৃ. ৬৮৬)

৩। The Modern Tradition, P. 707 (উৎস – তদেব, পৃ. ৬৮৬)

৪। Ibid, P. 112 (উৎস – তদেব, পৃ. ৬৮৭)

৫। জীবনানন্দ ঃ বিভিন্ন কোরাস। সম্পাদনা ঃ পল্লব সেনগুপ্ত, প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের উত্তরাধিকার – প্রদ্যুম্ন মিত্র, পৃ. ৪২, প্রকাশক – কর্মসচিব, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যায়, কলকাতা – ৭০০ ০৫০, প্রথম প্রকাশ – ৭ আগস্ট, ২০০০

৬। রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ ঃ দু-জন অসবর্ণ কবি, নিরুপম চট্টোপাধ্যায়, উৎস – জীবনানন্দ ঃ জীবন আর সৃষ্টি, সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত, পৃষ্ঠা – ৬৬৭, প্রকাশক – সমীরকুমার নাথ, নাথ পাবলিশিং, কলকাতা – ৭০০ ০২৯, প্রথম প্রকাশ – বইমেলা/জানুয়ারি ১৯৯৯/মাঘ ১৪০৫

৭। রবীন্দ্র-জগৎ, সমসময় ও জীবনানন্দ – উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, (উৎস – তদেব, পৃ. ৬৮১)

৮। প্রগতি, আশ্বিন ১৩৩৫; পুনর্মুদ্রিত বুদ্ধদেব বসু, প্রবন্ধ সংকলন, পৃষ্ঠা ৯৬, কলকাতা ঃ ভারবি, ১৯৬৬

৯। তদেব, পৃ. ৯৬

১০। তদেব, পৃ. ৯৭